নদীর ধারে বাড়ি

(গল্পগ্রন্থ – অসাধারণ)

শ্যামলীদের বাসা ছিল পীতাম্বর লেনে। দু নম্বর পীতাম্বর চৌধুরীর লেন। সেকেলে পুরনো বাড়ি, দোতলার ছটি ঘরে ছটি পরিবারের বাস। কলতলায় দুটিবেলা সমানে ঝগড়া চলে জল তোলা নিয়ে। শ্যামলী ওদের মধ্যে একটু দেখতে ভালো, বয়েস তিরিশের সামান্য ওপরে, দু-এক বছর ওপর। চার সন্তানের মা, দুটি মেয়ে, দুটি ছেলে।

বেলা দশটা বাজে।

শ্যামলীর স্বামী খেতে বসেচে। শ্যামলী ডালের বাটিতে হাত ডুবিয়ে সামনে বসে আছে।

—শ্যামলী বললে—ফিরবে কখন ?

শ্যামলীর স্বামীর নাম যদুনাথ ভট্টাচার্য। যদুনাথ একটা সওদাগরি আফিসে সত্তর টাকা মাইনের চাকুরি করে। যুদ্ধের বাজারে তাতে চলে না। খাওয়া-দাওয়ার অসীম কষ্ট। ছেলেমেয়েগুলো দুধ খেতে পায় না, দুটো শুকনো মুড়ি চিবোয় স্কুল থেকে এসে।

যদুনাথ বললে—ফিরতে সাতটার পরে।

—আর একটা বাড়ি দ্যাখো, বুঝলে ?

—সে তো বুঝলাম, বাড়ি মিলচে কই ?খুঁজতে কি কম করচি ?

—এ বাড়িতে আর টেকা যায় না।

—কালও ঝগড়া হয়েছিল ?

—কবে না হয় ?বিশ্বেস-গিন্নির সঙ্গে মতির মা-র ঝগড়া কালও খুব। অভয়ার সঙ্গে রামবাবুর বউয়ের ঝগড়া।

—জল তোলা নিয়ে ?

—তা আবার কি নিয়ে ! ও তো রোজকার ঘটনা, লেগেই আছে। রোজ রোজ এ ইতরুমি আর ভালো লাগে না। অসহ্য হয়ে উঠেচে।

যদুনাথ চলে গেল। শ্যামলীর ছেলেমেয়েরা খেয়েদেয়ে স্কুলে চলে গিয়েছিল, ছেলে দুটি বড়, তারা হাই-স্কুলে পড়ে। মেয়ে দুটি পড়ে মোড়ের কর্পোরেশন স্কুলে। ছোট রান্নাঘর, একটি লোক কায়ক্লেশে বসে দুটি আহার করতে পারে। আজ ন'টি বছর এ বাসায়, বড় মেয়ে লীলার বয়েস। এই বাসাতেই লীলার আঁতুড় হয়েছিল। রান্নাঘরের সামনে খোলা ড্রেনে তরকারির খোসা, ফেন, শাকের ডাঁটা, চিংড়ি মাছের খোসা জমে দুর্গন্ধ বার হচ্ছে। এই দুর্গন্ধ আর এই কুশ্রী দৃশ্য আজ ন'বছর ধরে সহ্য করতে করতে নাক অসাড় হয়ে গিয়েচে, এখন আর দুর্গন্ধকে দুর্গন্ধ বলে মনে হয় না।

বীণা ওপরের তলার মনোরঞ্জনবাবুর মেয়ে। সে শ্যামলীকে ভালোবাসে। কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে—কাকিমা কি রাঁধলে ?

—মুসুরির ডাল আর চচ্চড়ি।

—মাছ আনেননি কাকাবাবু ?

—নাঃ। দু টাকা চিংড়ি মাছের সের, মাছ আর কি কেনবার জো আছে ?উনি গিয়ে ফিরে এলেন।

—এবার রেশনের চালে কাঁকর খুব কম, কাকিমা। আপনারা রেশন আনেননি ?

—বুধবার আসবে রেশন। এখনো আনা হয়নি। তোমার কাকা যেতে সময় পাননি।

বিকেলে কলে জল আসতেই ওপরের ভাড়াটে গিন্নিরা বড় এক এক বালতি ঘড়া বসিয়ে দিলেন কলের মুখে। একজন একটা তুলে নিয়ে যায় তো আর একজনে একটা বসায়—এইজন্যে চৌবাচ্চায় মোটে কয়েক

ইঞ্চির বেশি জল জমতে পায় না। গা ধোবার কি কষ্ট বিকেলে ! এই গুমোট গরমে স্নিগ্ধ জলে স্নান করতে পারলে কি আনন্দই পাওয়া যেত। কিন্তু তা হওয়ার জো নেই। এক-একজন ছোবড়া আর সাবান নিয়ে নামবে ওপর থেকে, আধ ঘণ্টা ধরে থাকবে। প্রথমে নামবে অভয়া, তারপর নামবে মতির দিদি, এরা দুজনেই ভীষণ ঝগড়াটে। যতক্ষণ তারা কলতলায় গা ধোবে, ততক্ষণ কলে এক ঘটি জল কারো নেবার জো নেই—তাহলেই বাধবে ধুন্ধুমার ঝগড়া।

অভয়া বাঙাল দেশের মেয়ে। বেশ সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। শ্যামলীকে ডেকে বললে—ও দিদি, কি হচ্চে ?

—কুটনো কুটচি ভাই।

—কি কুটনো ?

—ঝিঙে আর ঢেঁড়স। আলু তো বারো আনা সের উঠেচে। আমাদের সাধ্যিতে কুলোলে তো কিনব।

—রেশন এসেচে ?

—না ভাই, বুধবারে আসবে।

—আমায় আধপোয়া চিনি দিতে পারবে দিদি তোমাদের রেশন থেকে ?

—আসুক আগে, দেখব এখন।

এদের মধ্যে সবাই সমান অবস্থার মানুষ। কেরানীর বউ। পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া-দ্বন্দ্ব করে এদের দিন কাটে। পান থেকে চুন খসলেই আর নিস্তার নেই। বিশ্বাসগিন্নি দলের মোড়ল, ওপরের ভাড়াটেদের সর্দার। তিনি সকলের হয়ে ঝগড়া করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর সর্দারিতে ওপরের মেয়েরা কোমর বাঁধে, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে এই অভয়া। দেখতে সুন্দরী হলে কি হবে, যেমনি স্বার্থপর তেমনি কুটিল মন। এই যে বললে চিনি দিতে হবে, 'না' বললে আর রক্ষে আছে ?কোন্ কালে এক বাটি নুন ধার দিয়েছিল, সেই ঘটনার উল্লেখ করে খোঁটা দিয়ে বলবে, বরিশালের টানে—আমরা কি কোনোদিন কিছু কাউকে দিই নাই কি ! সময়ে অসময়ে নুন রে—তেল রে—তা নিয়ে মনে থাকবে ক্যানে ?ঘোর কলি যে ! কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরালে পাজি—আচ্ছাআমরাও কি আর কখনো কাজে লাগব না ! তখন যেন ইত্যাদি।

এই বাসাটাতে কি গুমোট গরম। দক্ষিণ দিক চাপা, এতটুকু হাওয়া আসে না, প্রাণ আইঢাই করে গরমে। আজ ন বছর কষ্টভোগ চলচে। এই ঝগড়ার আবহাওয়া আর এই দারুণ স্থানাভাব। সকলের ওপরে এই অপরিষ্কার, নোংরা পরিবেশ। সবাই সমান অশিক্ষিতা, ভালো বললেও এ বাড়িতে মন্দ হয়। সেদিন অপরাধের মধ্যে ও শশীবাবুর স্ত্রীকে বলেছিল—দিদি, চিংড়ি মাছের খোসাগুলো একেবারে সামনেই ফেললেন, কলতলায় সকলেরই যেতে আসতে হয়—সকলেরই তো অসুবিধে।

আর যাবি কোথায় ! শশীবাবুর বউ চিৎকার জুড়ে দিলে—আমি কি একলা ফেলি নাকি, সবাই তো ফেলে, কেনই বা না ফেলবে, ভাড়া দিয়ে সবাই বাস করে, কারো একার সম্পত্তি তো নয়; সবারই সুবিধে এখানে দেখতে হবে—যদি তাতে অসুবিধে হয় তবে গরিব ভাড়াটেদের সঙ্গে বাস করা কেন, তাহলে দোতলা বাড়ি আলাদা ভাড়া নিয়ে বালিগঞ্জে গিয়ে বাস করলেই তো হয়—ইত্যাদি।

শ্যামলীও চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়, সে বললে—দিদি, কি পাগলের মতো বকচেন ?আপনি চিংড়ি মাছের খোসা ফেলবেন তাতে কেউ বারণ করছে না, তবে আমারই রান্নাঘরের সামনে কেন ফেলবেন ?কেন আমি তা ফেলতে দেব ?

—ফেলতে দেবে না তোমার কথায় ?কি তুমি এমন লাট সায়েব এয়েচ রে বাপু ! তুমি পাগল না আমি পাগল ?রান্নাঘরের বাইরের জায়গা তোমারও যা, আমারও তা—তুমি বলতে আসবার কে ?

—তা বলে পরের সুবিধে অসুবিধে যারা না দেখে তারা আবার মানুষ ?তাদের আমি ঘোর অমানুষ বলি।

এই পর্যন্ত গেল সাধারণ ভাবের কথা, একে ঝগড়া বলে অভিহিত করা যায় না। এর পর বাধল আসল ঝগড়া, যার নাম—। শ্যামলী ছাড়লে না, শশীবাবুর বউও না—উভয়পক্ষে বাধল কুরুক্ষেত্র। তারপরে কথা একদম বন্ধ হয়ে গেল দুপক্ষেই। নানারকম শত্রুতা আরম্ভ করলেন শশীবাবুর প্রৌঢ়া স্ত্রী। ছেলেমেয়ের হাত ধরে খোলা ড্রেনে বসিয়ে দিতে লাগলেন সকালবেলা, পায়খানা থাকা সত্ত্বেও, প্রায় শ্যামলীর রান্নাঘরের সামনেই। কিছু বলবার জো নেই। ওই আর এক গোলমাল, একটি মাত্র পায়খানা নিচে। মেয়ে-পুরুষ তাতে যাবে। কি নোংরা করেই রাখে মাঝে মাঝে ! ভোরে অন্ধকার থাকতে যদি ঘুম ভাঙে, তবে কলপায়খানা ব্যবহার করা যাবে সেদিন, নয়তো বেলা এগারোটা, পুরুষরা সবাই আপিসে বেরিয়ে গেলে। চৌবাচ্চায় তখন দু'ইঞ্চি মাত্র জল থাকে কোনোদিন, কোনোদিন তারও কম।

শ্যামলীর দম বন্ধ হয়ে আসে।...

এমন কি কোনো বাসা পাওয়া যায় না যাতে অন্তত মেয়েদের একটা আলাদা নাইবার জায়গা আছে ?...

আষাঢ় মাসের প্রথম।

ফিরিওয়ালা গলির মধ্যে হাঁকচে—চাই ল্যাংড়া আম—ল্যাংড়া আ-আ-ম—

বৃষ্টি এখনো নামেনি এবার। জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম প্রায় সমান ভাবেই চলচে। মতির ছোট বোন এসে বললে—দশ পলা তেল ধার দেবেন কাকিমা ?

শ্যামলী বললে—হবে না। তেল নেই।

—আট পলাও হবে না ?

—কিছু নেই।

মেয়েটা চলে গেল। শ্যামলী তেল দেবে কি, ওদের কোনো আক্কেল নেই। শ্যামলী কি সাধে বিরক্ত হয়েচে ?উনি খারাপ কলের তেল খেতে পারেন না বলে এক নম্বর কানপুর কিনে আনেন ওঁর আপিসের রেশন বেচে। সে কী ঝাঁজওয়ালা তেল। মতিরা এক কৌশল ধরেচে কি, বিশ পলা সেই ভালো তেল হপ্তায় ধার নেবে, আর ধার শোধ দেবে পাঁচসিকে সেরের কলের তেল দিয়ে।

উনি বলেন, ও তেল খেলে বেরিবেরি হয়। শ্যামলীদের ফি হপ্তায় বিশ পলা তেল অপব্যয়ে যায়।

ওরা চালাক আছে। একবার নেবে দশ পলা, তারপর আর একদিন এসে দশ পলা। একসঙ্গে নেবে না, একেবারে যেন মৌরসী পাট্টা করে বসেচে !...দেব না তেল রোজ রোজ ও চালাকি খাটবে না আমার কাছে। দেখি কি হয় !

কিন্তু মতির মায়ের কৌশল অন্যরকম। সে এতটুকু চটল না, আবার একবার বাটি হাতে এসে হাজির স্বয়ং মতির মা।

—ও শ্যামলী, দে দিকি ভাই একটু তেল !

—তেল নেই দিদি।

—দিতেই হবে। মাছ ভাজা হচ্চে না, পাঁচ পলা তেল দে—

—যা আছে আমারই কুলোবে না দিদি—

—দেখি তোর তেলের বোতল ?দে ভাই আমায় পাঁচ পলা—

অগত্যা শ্যামলী উঠে গিয়ে তেল দেয়, ও আবার পরের কাঁদুনি-মিনতি বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। ঠকচে তো দেখাই যাচ্চে, ঠকুক। লোকে তাতে খুশি হয়, হোক।

কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে দোতলার ভাড়াটেদের মধ্যে মহা ঘোঁটমঙ্গলের সৃষ্টি হল। মতির মা গিয়ে সাতখানা করে লাগিয়েচে তাদের কাছে।...তেল থাকতেও দিতে চাচ্ছিল না, বোতল দেখতে চাইলুম, তাই তো দিলে। এমন ছোট নজর তো কখনো করতে পারি নে আমরা। এই যে সেদিন বোশেখ মাসে ওঁর পেটের ব্যথা ধরল রাত্তিরে, যদুবাবু সোডা চেয়ে নিয়ে যাননি আমাদের এখান থেকে ?দিইনি আমরা ?লোকের কাছে হাত পেতে যেমন নিতে হয়, তেমনি দিতেও হয়। তবে লোকে মানুষ বলে।

তার পরের দিন আর কলতলায় যাওয়া যায় না। বড় বড় বালতি, ঘড়া আর টব পড়ল একের পর এক সকাল থেকে। সে সব সরিয়ে এক বালতি রান্নার জল নিতে গেলেও ঝগড়ায় মুখর হয়ে উঠবে সারা বাড়িটা—সেকথা শ্যামলী ভালো রকমেই জানে, অনেকবারের অভিজ্ঞতায় জানে। সুতরাং আষাঢ় মাসের গুমোট গরমে বেলা এগারোটা পর্যন্ত তাকে অস্নাত অবস্থায় থাকতে হল। এগারোটার পর কলের জল কখন চলে গেল। যখন সে নাইতে গেল, তখন চৌবাচ্চায় ইঞ্চি চারেক মাত্র জল। কাকের মুখ থেকে তার মধ্যে পড়েছে ভাত।

এই সময়ে একদিন যদুবাবু এসে বললেন, ওগো শোনো, একটা সন্ধান পেয়েচি। রাণাঘাট থেকে নেমে যেতে হয় প্রায় এগারো মাইল উত্তরে, বল্লভপুর বলে পাড়াগাঁ। সেখানে কলকাতার এক বড়লোকের জমিদারি কাছারি ছিল, বিক্রি করে ফেলেচে। মাঝে মাঝে যেত বলে কাছারিবাড়ির সংলগ্ন দোতলা বাড়ি তৈরি করেছিল, ওপরে নিচে পাঁচখানা ঘর, বারান্দা, রান্নাঘর, নাইবার ঘর সব আছে। দশ বিঘে জমির ওপর কাছারিবাড়ি, তাতে আমকাঁঠালের গাছ, কলাগাছ আছে। বাড়ির সেই জমির নিচে দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে যাচ্চে, তাতে জমিদার বাঁধানো ঘাটলা করে দিয়েচেন, বাড়ির মেয়েরা যখন গিয়ে থাকত তাদের নাইবার সুবিধার জন্যে। সবসুদ্ধ তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা হলে বাড়িটা পাওয়া যায়—জমিসুদ্ধ—কিনব ?প্রভিডেন্ট ফন্ডের টাকা সব যদি তুলে নিই—

—অত কমে হবে ?

—পাড়াগাঁ। কে সেখানে খদ্দের হচ্চে ?যদ্দূর শুনলাম, চাষা গাঁ। গাঁয়েও অত টাকা দিয়ে কেনবার লোক নেই।

—টাকা দেবে কোথা থেকে ?

—প্রভিডেন্ট ফন্ডের টাকা সব তুলে নিই। তোমার গহনা কিছু দাও আর ইনসিওরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে কিছু ধার করি। আমার কাছেও সামান্য কিছু আছে।

শ্যামলীর মন নেচে উঠল। কতদিন সে পাড়াগাঁয়ের মুখ দেখেনি। বাপের বাড়ি ছিল হুগলীজেলার তারকেশ্বর লাইনে দাসপুর গ্রামে। সে বংশে বাতি দিতে কেউ নেই। জ্ঞাতি কাকারা পর্যন্ত উঠে এসে কলকাতায় বাস করচেন, ঘোর ম্যালেরিয়া, চলে না সেখানে থাকা।

যদি এ সম্ভব হয় !

ভগবান কি এত দয়া করবেন ?তা কি তার কপালে সম্ভব হবে ?

শ্যামলী বললে—কিন্তু তুমি কোথায়থাকবে ?

—কেন, সেখানে !

—আপিস ?

—চাকুরি ছেড়ে দেব। একঘেয়ে হয়ে গিয়েচে এ জীবন। আর ভালো লাগে না। স্বাস্থ্য যেতে বসেচে। একটু সাহস করে দেখি, যা আছে কপালে ! ওখানে জায়গাজমি নিয়ে চাষবাস করব।

—ছেলে দুটোর লেখাপড়া ?

—রাণাঘাটে বোর্ডিংয়ে থাকবে। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখন। আর এ যা লেখাপড়া শিখচে, এ শিখে তো কেরানী হবে। তার চেয়ে ভালো কাজ ওখানে শিখতে পারবে। বিলেত থেকে লোক গিয়ে আমেরিকায় বাস করে আমেরিকা যুক্তরাজ্য স্থাপন করেছিল। অজানায় পাড়ি না দিলে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে না। জীবন উপভোগই যদি না করলুম, বেঁচে থেকে কি হবে ?গ্রামের লোকদের কাছে দুটো ভালো কথা বলব। নাইট স্কুল করব। বই পড়তে শেখাব। এ আমার অনেক দিনের ইচ্ছা।

স্বামী-স্ত্রীতে মিলে সারা বিকেল আর রাত ধরে পরামর্শ হল। শ্যামলীর চোখে রঙিন স্বপ্ন ভেসে উঠেচে—দূরের পাখি-ডাকা ফুল-ফোটা সুমুখ জ্যোৎস্নারাত্রির প্রহরগুলি। কত অলস মধ্যাহ্নে বনানীকোলে ঘুঘুর ডাক শোনা—বিছানায় আধ-জাগরিত আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় শুয়ে শুয়ে ! কত আম্রমুকুলের গন্ধে সুবাসিত সকাল-সন্ধ্যা।

দিন-পনেরো পরে।

যদুবাবুর সঙ্গে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক শ্যামলীদের বাসায় ঢুকলেন। যদুবাবু বললেন, উনি এখানে খাবেন।

শ্যামলীকে আড়ালে বললেন—উনি ওদের স্টেটের নায়েব, ওঁরও নাম যদুবাবু। তবে উনি কায়স্থ। আমাকে বলেকয়ে উনিই বাড়ি দেওয়াচ্ছেন। অতি ভদ্রলোক। একটু ভালো করে খাওয়াও-দাওয়াও। সাড়ে তিনের মধ্যে হয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে জমিদারের খাস কিছু রোয়া ধানের জমি আছে, সেটাও ওই সঙ্গে হয়ে যাবে।

আহারাদির পরে ভদ্রলোক অনেকক্ষণ কি পরামর্শ করলেন যদুবাবুর সঙ্গে। তারপর চা খেয়ে বিদায় নিলেন। এর তিনদিন পরে শ্যামলীকে যদুবাবু বললেন, বাড়ি রেজিস্ট্রি করা হয়ে গিয়েচে।

আষাঢ় মাসের শেষের দিকে জিনিসপত্র গুছিয়ে শ্যামলীরা তাদের নতুন কেনা বাড়িতে বাস করতে চলল। কলকাতার বাসা একেবারে উঠিয়ে দিলে না, কিছু কিছু জিনিসপত্র ঘরে রেখে ঘর চাবিবন্ধ করে গেল।

রাণাঘাট থেকে ট্রেন বদলে ওরা বেলা দশটার সময় বনগাঁ লাইনের গাংনাপুর স্টেশনে নামল। আগে থেকে বন্দোবস্ত করার ফলে বল্লভপুর গ্রামের একখানা গরুর গাড়ি স্টেশনে উপস্থিত ছিল।

মাঠ ও বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এ-গ্রাম ও-গ্রাম পেরিয়ে চলল গাড়ি। বেলা প্রায় তিনটের সময় সামনের একটা ঝাঁকড়া বটগাছ দেখিয়ে গাড়োয়ান বললে—ওই বুঁদীপুরের বনবিবিতলা দেখা যাচ্চে—ওর পরেই বল্লভপুর।

শ্যামলীর বুক দুলে উঠল। কি জানি কেমন হবে এত আশা-সুখে কেনা বাড়িটা, কেমন হবে সেখানকার জীবনযাত্রা ! জানাকে ফেলে অজানাকে তো আঁকড়ানো হল চোখ বুজে, এখন সেইঅজানার প্রকৃতি কি, সেটা এখুনি তো বোঝা যাবে আর একটু পরেই। কি গিয়ে দেখবে যে সেখানে, কি জানি ?সর্বস্ব খুইয়ে তার বিনিময়ে কেনা !

ক্রমে আরো আধঘণ্টা কেটে গেল। বেলা বেশ পড়ে এসেচে। এমন সময়ে গাড়োয়ান বললে—এই যে বাবু, বাড়ির সামনে এসে গিয়েছে গাড়ি। নামুন মা-ঠাকরুন এবার।

দুরু দুরু বক্ষে শ্যামলী নামল সকলের আগে। যদুবাবু বললেন—না দেখে বাড়ি কেনা। এতগুলো টাকা—বলতে গেলে সর্বস্ব খুইয়ে—এই দূর গাঁয়ে বাড়ি কেনা। তুমি আগে নেমে বাড়িতে ঢোকো। মেয়েরা ঘরের লক্ষ্মী কিনা, তুমি আগে ঢোকো। আমার তো সাহস হচ্ছে না, কি জানি কি রকম হবে ! নামো আগে।

—হ্যাঁগো বাড়ি কি পরিষ্কার করা আছে, না একখানা ধুলো আর মাকড়সার জাল আর চামচিকের বাসা। গিয়ে এখন ঝাঁট দিতে হবে ?চাবি কোথা ?

গাড়োয়ান শুনতে পেয়ে বললে—মা ঠাকরুন, বাড়িতেই আছে মুক্তোর মা গয়লানী আর তার ছেলে। তারাই বাড়ি দেখাশুনো করে, নিচের একটা ঘরে আছে। চাবি তো নেই, বাড়ি খোলাই পড়ে আছে।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে একেবারে শ্যামলীর সামনেই যে বাড়িটা পড়ল, সেটা দেখে সে আনন্দে ও বিস্ময়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এই বাড়ি ওদের ! এমন বাড়ি এই অজ পাড়াগাঁয়ে !

কলকাতায় এমনি হলদে রঙ করা সবুজ রঙের জানালা-খড়খড়িয়ালা দোতলা বাড়ি দেখেচে—দোতলাও মস্ত, বাড়িটা তেতলা—কিন্তু এমন বাড়িটা সত্যিই তাদের নিজস্ব।

শ্যামলী আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললে—ওগো দ্যাখো, এসে দ্যাখো—

পরক্ষণেই ওর লজ্জা হল। গাড়োয়ানটা না জানি কি আদেখ্‌লেই মনে করলে ওকে ! ততক্ষণে যদুবাবুও ছেলেমেয়েরা বাঁশঝাড়ের মোড় ছাড়িয়ে বাড়ির কাছে এসে গিয়েচে। যদুবাবু বললেন—বাঃ, বেশ—বেশ—

রাস্তায় আসতে গাড়োয়ানকে যদুবাবু বাড়ির কথা বহুবার জিজ্ঞেস করেছিলেন। সে বলেছিল—চমৎকার বাড়ি বাবু। কলকাতার বাবুরা থাকবার জন্যি করেলেন। তেতলা বাড়ি, দরাজ জায়গা, নদীর ধারে বাঁধাঘাট আছে, ফলপাকড়ের গাছ। দ্যাখবেন বাড়ির মতো বাড়ি !

কিন্তু ছোটলোকের সে কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারেনি শ্যামলী বা তার স্বামী। এখন বাড়িটা দেখে মনে হল গাড়োয়ান অনেক কমিয়ে বলেছিল। বাড়িটা সম্বন্ধে আসল কথা হচ্চে, অনেকখানি ফাঁকা জায়গার মধ্যে বাড়িটা দাঁড়িয়ে, অথচ ঠিক পাশেই গ্রামের বসতি।

বনানীর ও মাঠের সবুজের মধ্যে হলদে রঙের বাহার।

ওরা হুড়মুড় করে সবাই গিয়ে বাড়ি ঢুকল। নিচের ঘরে গিয়ে দেখলে সেখানে এক বুড়ি মাদুরের ওপর ঘুমিয়ে আছে। শ্যামলী ডাকলে—ও ঝি—কি যেন নাম ওর—মুক্তোর মা ! ও মুক্তোর মা—

বুড়ি ধড়মড় করে জেগে উঠে বসল। তারপর ঘুমজড়ানো চোখে ওদের দিকে খুব সামান্য একটুখানি চেয়ে থেকে তাড়াতাড়ি মাদুড় ছেড়ে উঠে এসে শ্যামলীর পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করে বললে—পোড়াকপাল আমার মা, ঘুমিয়ে পড়িচি এই অবেলায়। বেন্‌বেলা থেকে ওপরে নিচে সব ঘর ধোলাম, পোঁছলাম, ছাদ ঝাঁট দেলাম, বলি মা ঠাকরুনরা আসচেন, বাবু আসচেন—তা ছাদ তো নয় গড়ের মাঠ, এই হাতির মতো বাড়ি ধোয়ানো সামলানো কি এক দিনের কম্মো ?আসুন মা ঠাকরুন, আসুন বাবা...

শ্যামলী বললে—তোমার নাম মুক্তোর মা ?

—বলে সবাই। বলো না, অদেষ্টের মাথায় মারি সাত খ্যাংরা। নামটাই আছে বজায়, যার জন্যি সে আর নেই। তা হলি কি আজ আমার ভাবনা—

শ্যামলীর ওসব কথা ভালো লাগছিল না। তার ইচ্ছে হচ্ছিল এক দৌড়ে বাড়িটার ওপর নিচে সব দেখে আসে। কিন্তু কী মনে করবে এরা। কী মনে করবে মুক্তোর মা !

ওরা সবাই মিলে নিচের ঘরগুলো দেখলে। বড় বড় দুটো ঘর, প্রশস্ত থামওয়ালা ঝিলিমিলি বসানো বারান্দা, ওদিকে অন্য একটা ছোট রোয়াকের সামনে রান্নাঘর। শ্যামলীর বড় ছেলে কানাই বললে—মা, এ তো রান্নাঘর নয়, এ আমাদের কলকাতার বাসার ঘরের চেয়েও অনেক বড়। দ্যাখো কেমন আলমারি দেওয়ালের গায়ে !

বড় মেয়ে ডলি বললে কতগুলো জানলা দ্যাখো মা রান্নাঘরে !

ওপরে সিঁড়ি বেয়ে দুড়দুড় করে সবাই উঠল। শ্যামলী বললে—ওগো, দ্যাখো কি সুন্দর মেজে ! কাচে শার্সি বসানো জানলা !

কানাই ও ছোট ছেলে বলাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললে—কি সুন্দর সিনারি, দেখে যাও মা বারান্দা থেকে—ওই তো মাঠটার পরেই কেমন সুন্দর ছোট্ট নদীটা, ওপারে সবুজ মাঠ, কেমন ঝোপ আর বাবলা গাছ, গরু চরচে—ও কি ফুল ফুটেচে ওপারের ক্ষেতে বাবা ?

যদুবাবু বললেন—ও ঝিঙের ফুল। বর্ষাকালে সন্দের সময় ঝিঙের ফুল ফোটে কিনা ! সত্যি, ভারি সুন্দর সিনারিই বটে, ওগো দ্যাখো ইদিকে এলে কি ফাঁকা !

শ্যামলী বললে—তেতলার ঘরটা মেয়ে আমি চলো।

তেতলার ঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। কিন্তু খুব বড় বড় তিনটি জানালা তিনটি দেওয়ালে। রাঙা মাটির পালিশ করা মেজে। দরাজ ছাদ, ছাদের ওপর থেকে বহুদূরব্যাপী মুক্ত মাঠের সবুজ বাণী এই আষাঢ় সন্ধ্যায় ওদের অন্তর স্পর্শ করলে। শ্যামলীর চোখে জল এল। এ যে রূপকথার রাজবাড়ি তার কাছে, সে গরিব ঘরের মেয়ে, গরিব ঘরের বউ, কলকাতার বাসার অন্ধকূপে আজীবন কাটিয়ে আজ কি ভাগ্যে এমন বাড়িঘর নিজের মনে করবার অধিকার পেল। কানাই ইতিমধ্যে ছুটে এসে বললে—বাঁধাঘাট দেখে এলাম মা। একটু ভেঙে ভেঙে চটা উঠে গিয়েচে চাতালের, তবুও দিব্যি আরামে নাইতে পারবে। ওই তো—দেখা যাচ্চে—এই উঠোনটা পার হয়েই—

যদুবাবু বললেন—নাঃ, সাড়ে তিন হাজার টাকা নিক। জিনিসের মতো জিনিস। বাড়ির মতো বাড়ি। ছেলেপুলে নিয়ে দরাজ জায়গায় বাস করো। এই তো পাশেই গাঁয়ের কি পাড়া। ডাক দিলেই লোক পাবে। কোনো ভয় নেই। আমি এখানেই একটা কিছু করব। এত লোকের চলচে আর আমার চলবে না ?খুব চলবে। তোমরা দাঁড়াও জিনিসপত্তর সব ওপরে নিয়ে আসি। কি কি গাছ আছে মুক্তোর মা ?

মুক্তোর মা বললে—তিনটে আমগাছ আছে, সাতটা কাঁটাল গাছ, একটা পেয়ারা গাছ, একটা চালতে গাছ, একটা বিলিতি কুলগাছ, দুঝাড় কলাগাছ, চারটে নারকোল গাছ। বাবুরা নিজির হাতে সব লাগিয়েছিল থাকবে বলে। শখ করে কলকেতা থেকে চারা এনে এই ওবছর ওই দ্যাখো একটা চাঁপাফুলগাছ বসিয়ে গিয়েচে।

একটু পরে সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকার নামল। শ্যামলীর দুঃখ হল, এখন আর কিছু দেখা যাবে না। নতুনতর জীবনযাত্রার পথে নতুনতর দেশের প্রতি পথঘাট চিনে নেওয়া যেত, ভালো করে দেখা যেতো আলোভরা দিনমানে।

শ্যামলী তাড়াতাড়ি লণ্ঠন জ্বাললে—ডাকলে—মুক্তোর মা, ও মুক্তোর মা—

মুক্তোর মা মালপত্র গাড়ি থেকে নামিয়ে এনে দোতলায় তুলছিল। বললে—কি মা ?

—জল আছে বাড়িতে ?

—জল তুলে রেখেচি একটা বালতিতে, আর তো পাত্তর নেই মা তাই তুলতে পারিনি।

—সে কথা বলচি নে, বাড়িতে জল আছে ?কুয়োটুয়ো—

—বাঁধানো পাতকুয়ো আছে। নাওয়ার ঘর আছে, রান্নাঘরের পেছনে। চলুন, আমি দেখিয়েদি। বাবুদের বাড়ি কোনো ত্রুটি ছিল না মা, আগাগোড়া সান বাঁধানো। চৌবাচ্চা আছে বাঁধানো।

—তাতে জল তুলে রাখোনি ?

—নাইবেন যদি তবে পাতকুয়োর জলে কেন মা ?দিব্যি বাঁধানো নদীর ঘাট, অসাগর জল নদীতে। এখন জোয়ার এসেচে, সব পৈঠেগুলো ডুবে গিয়েচে। চলুন গা ধুয়ে আসবেন।

শ্যামলী নদীর ঘাটেই নাইতে গেল। ঘাটের ঠিক পাশে কি একটা বড় প্রাচীন গাছ। তার ছায়া পড়েছে বাঁধাঘাটের পৈঠেগুলোতে। কি একটা পুষ্পের সুবাস বাতাসে ভুরভুর করচে, এই গাছ থেকেই আসচে !

—কি ফুলের গন্ধ মুক্তোর মা ?

—কি একটা লতা এই গাছে উঠেছে মা, কাল সকালে দেখবেন সাদা সাদা ফুল ফুটেচে। ভারি বাস বেরোয় রাত্তিরি।

শ্যামলী জলে নামল। আজ সে রূপকথার রাজকন্যে। স্নিগ্ধ জল, ওপারের দিক থেকে হাওয়া বইচে। সেই ফুলের সুগন্ধ। তারাভরা আকাশ। এই বাঁধা ঘাট, এই প্রাচীন কি বনস্পতি, এই বনপুষ্প-সুবাস—সব তাদের, নিজস্ব। তারা পয়সা দিয়ে কিনেচে। কলকাতায় সেই পচা ড্রেন, কলতলা, অভয়া, বিশ্বাসগিন্নি সব স্বপ্ন হয়ে

গিয়েচে একদিনে। তাদের জন্যেই সত্যি কষ্ট হল। বেচারি মতির মা ! বেচারি শশীবাবুর বউ ! ওদের একবার এখানে আনতে হবে। না, এও স্বপ্ন, এখনো যেন বিশ্বাস হয় না এত সৌভাগ্য।

ডলি চেঁচিয়ে ডাকচে দোতলার বারান্দা থেকে—ওমা, শিগগির গা ধুয়ে এসো—বাবা চা চাইচে...এসো চট করে—

শ্যামলী স্বপ্নলোক থেকে নেমে এল। সাবানের বাক্সটা নেই। আনতে ভুলে গিয়েচে তাড়াতাড়িতে।

—মুক্তোর মা, ছুটে যাও, বড়দিদিকে বলগে যাও, ছোট তোরঙ্গের মধ্যে সাবানের বাক্সটা আছে, দিতে।